

সূরা কাহফ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১১০

পরম দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাখিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে—যারা সংকর্ম সম্পাদন করে—তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা! তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সন্তবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীই সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছে, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোআ করে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই।

সূরা কাহফ

সূরা কাহফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত : মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লেখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি রেওয়াজে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে মু'আযের রেওয়াজে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্যে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্যে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহফ তেলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কেয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুমআ থেকে এই জুমআ পর্যন্ত তার সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। - (ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়াজেটিকে মওকুফ বলেছেন)

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ্' গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফেৎনা থেকেও মুক্ত থাকবে - (এসব রেওয়াজেতে ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।)

রাহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সূরা কাহফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাখিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

শানে নুযুল : ইমাম ইবনে জরীর তাবারী হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন : যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ী'তকে মদীনার ইহুদী পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে তারা কি বলে, জানার জন্যে। ইহুদী পণ্ডিতরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করো। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নেবে যে, তিনি আল্লাহর রসূল। অন্যথায় বোঝবে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী-রসূল নন। (এক) তাঁকে এসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। (দুই) তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্বে সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? (তিন) তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উভয় কোরায়শী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বলল : আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলেমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাযির হল। তিনি শুনে বললেন :

আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। কোরাযশরা কিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর আলোকে জগুয়াব দেবার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পর দিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না; বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাফিল হল না। অবস্থাদুটে কোরাযশরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুশিয়ার করার জন্যে বিলম্ব ওহী নাফিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে :

وَلَا تُؤْمِنُ أَشْيَاءُ رَأَيْتَ —এ সূরায় যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি

বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ‘আসহাবে কাহফ’ বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জগুয়াবও — (কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জগুয়াব সংক্ষেপে দেয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরােলের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই সূরা কাহফকে সূরা বনী ইসরােলের পরে স্থান দেয়া হয়েছে।—সুযুতী)

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعْلَى الْأَرْضِ رَيْبَةً لِّهَا —অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্তু,

উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি—এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশৃঙ্খলার গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।

শব্দার্থ : كهف - এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। رقيم - এর শাব্দিক অর্থ মরুম বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতদুটে যাহহাক, সুদী ও ইবনে জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ এই ফলকে আসহাবে কাহফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহফকে রকীমও বলা হয়। কাতাদা, আতিয়া, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাবেহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী

একটি শহরের নাম। فَتَى শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فتي -অর্থ যুবক। فَضْرًا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকূহর বন্ধ করে দেয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়ায শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াযের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

আসহাবে কাহফ ও রকীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। (এক) ‘আসহাবে কাহফ’ ও ‘আসহাবে রকীম’ একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু’টি দল? যদিও কোন সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বোখারী ‘সহীহ’ নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু’টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু’টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংকাজের উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি ঠাট্টাভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদুটে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো’মান ইবনে বশীরের রেওয়াজেতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো’মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়াজেতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ সেহাহ্ সেস্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়াজেতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো’মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বোখারীর রেওয়াজেতেও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্যও একবার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের

দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদু তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

হাফেয ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

এ কাহিনীর দু'টি অংশ রয়েছে। (এক) এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, যদ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশ। (দুই) কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফের বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্বরূন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞানোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ (আঃ)-এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আসহাবে কাহফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ একান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রশ্নে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যেই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশী এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যাকিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্যজন এমনভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَأْتِيهِمْ أَمَدًا ﴿١٥﴾
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٧﴾ وَرَبِّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْوَامًا فَفَاخَلُوهُ
 رَبِّيَأْتِي رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهَا إِلَهًا قَدًّا
 قُلْنَا إِذْ أَشْطَا هَؤُلَاءِ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْ
 لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَقْرَبَى
 عَلَى اللَّهِ كُنِيَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَإِنَّمَا يَدْعُونَ اللَّهَ
 فَأَلَّا إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَمِرُّ لَكُمْ رُكُوعًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْتَفِي لَكُمْ
 مِنْ أَمْرِكُمْ مُرَقَّاتًا ﴿١٨﴾ وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوْرَعُنَّ
 كَهْفَهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْ ذَاتِ الشِّمَالِ
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ اللَّهُ يُهْتَدَى
 اللَّهُ هُدًى وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ يُجَدَّ لَهُ وَلَا يُلَاقَى مُرْشِدًا ﴿١٩﴾ وَ
 نَحْسِبُهُمْ آيَاتِنَا أَهْلًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقُولُ لَهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ
 ذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَاهُ يَلْوِصُهُمْ إِذَا طَلَعَتْ
 عَلَيْهِمْ لَوْ كَيْتٌ مِنْهُمْ فَزَارًا وَكَلْبُهُمْ رُغْبًا ﴿٢٠﴾

(১৫) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। (১৬) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সংগে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৭) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৮) এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রশংসা প্রকাশ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৯) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা শুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। (২০) তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদ্ভিত হয়, তাদের শুহা থেকে পাশ কেটে জন দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা শুহায় প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সংগে চালান, সেই সংগেই পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (২১) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই জানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি শুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের অঙ্গে আড়ৎকল্প হয়ে পড়তে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুইনের হেফাজতের জন্যে শুহায় আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রীষ্টপূর্ব বৈরাগ্যকে যথেষ্ট সর্কশমান অঙ্গ মনে করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এরূপের ঘটনাবলী এতবেশী সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর এবাদতের জন্যে শুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন সেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহফের স্থান ও কাল : তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু ক্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহাফকের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি শুহায় একশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি শুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়তরা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহফ। শুহায় নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত আছে : একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়া বলেন : গার্নাতায় 'নাগুশা' নামক গ্রামের অনুরে একটি শুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই শুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুখু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে, এরাই আসহাবে কাহফ। ইবনে আতিয়া বলেন : এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে গৌছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন : গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাফিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহফ বলাতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়াও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহরে-মুহীতে গার্নাতার এই শুহায় প্রসঙ্গ কুরতুবীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়ার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ, কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই শুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত

বিদ্যমান রয়েছে এক দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন : ইবনে আতিয়া যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়ান লিখেছেন : ‘যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খ্রীষ্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র’। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়ানের মতে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।— (তফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর রেওয়াজেতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা কিলিস্তানের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রকীম কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা’বে আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।—(রুহুল-মা’আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুন্যের ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)—এর সাথে রোমীয়দের মোকাবেলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে ‘গাযওয়াতুল মুযীক’ বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এক্ষণ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বাধা করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন : ‘‘আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন’’। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্যে প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌঁছে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হওয়া এসে তাঁদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।— (রুহুল মা’আনী, ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লেখিত রেওয়াজেতে ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। (এক) পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়াজেতে এরই সমর্থন করে।

(দুই) ইবনে আতিয়ার দেখা ও আবু হাইয়ানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গানাদায় অবস্থিত। এ দু’টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনভাবে গানাদায় গুহা সলেগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়াজেতে মধ্য কেউই এমন অকাট্য কয়সাল গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়াজেতে স্থানীয় জনশ্রুতি ও

কিংবদন্তির উপর ভিত্তিশীল।

(তিন) কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়াজেতে আসহাবে কাহ্ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম ‘আফসূস’ এবং ইসলামী নাম ‘তরসূস’ বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলীর নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ আসহাবে কাহ্ফের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রীষ্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাটাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন ‘বাত্রা’। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে ‘রকম’ অথবা ‘রাকেম’ বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাক্স সম্পত্তি সম্পর্কে যে ‘রকম’ অথবা ‘রাকেমের’ উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্যে বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে যোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্টা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তফসীরবিদ ‘আফসূস’ নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্না) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সূলায়মান নদভীও ‘আরদুল কোরআন’ গ্রন্থে পাট্টা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্টা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মওলানা হিফযুর রহমান ‘কাসাসুল কোরআনে’ একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও ‘সহীফা সুইয়ার’ বরাত দিয়ে পাট্টা শহরের নাম রাকেম বর্ণনা করেছেন।— (দায়েরাতুল মা’আরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আশ্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান

পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইবেলিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হাক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর তিন শ' বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসুলুল্লাহ (সঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হাক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসুস' অথবা 'তরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়াজেত ও আধুনিক ঐতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরম্ভ করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়াজেত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিভূপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর এবং রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়াজেত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসুস অথবা তরতুস শহরের নিকটেই ঘটেছে।

আসহাবে কাহফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়াজেত রয়েছে যে, আসহাবে কাহফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্যে দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তাআলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়াজেতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন : “কাতাদা বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : তাদের হাড় তো তিনশ' বছর পূর্বেই মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে।”

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও

এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাটা ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়।

إِنَّمُؤْتَيْنِ - فتى - এর বহুবচন فتية অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ

লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিষ্কৃষ্ট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুর্গহ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কোরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক।—(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান)

وَرَبِّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ - ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা

বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাযির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবেলায় হত্যা, মৃত্যু ও যে কোন বিপদাপদ সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের এবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্যে কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأَوَّلَىٰ آلِ الْكَافِبِ - ইবনে কাসীর বলেন : আসহাবে কাহফের

অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহর এবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরের সুন্যত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর এবাদত করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফের তিনটি বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসেবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

(এক) দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল।

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ - বাক্য থেকেও বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে

রোদ থেকে হেফায়তের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।—(মাযহারী)

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে,

আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সম্বন্ধে তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যতঃ এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফাযত করা — যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্ফের কুকুর : সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বোখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পৃথক থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায় — (কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম)। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে ; অর্থাৎ, শস্যক্ষেত্রের হেফাযতের জন্যে পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসহাব কাহ্ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবতঃ ব্রীষ্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাযতের জন্যে কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সং সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়্যা বলেন : আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরীতে

মিসরের জামে মসজিদে আবুল কবল জওহরীর একটি ওয়ায শুনেছেন। তিনি মিয়রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সংলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্ফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সংলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহর গুলী ও সংলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্যে সান্দ্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) — কে মনে গ্রাসে ভালবাসে।

সহীহ্ বোখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ! কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কেয়ামতের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্যে তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল : আমি কেয়ামতের জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন : যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কেয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সঃ) — এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস আরও বলেন : (আলহামদুলিল্লাহ্,) আমি আল্লাহ্কে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। — (কুরতুবী)



(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ ? তাদের কেউ বলল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর ; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য ; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের খর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। (২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা স্জাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল : আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব। (২২) অস্জাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন ; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে : তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে : তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না।

আনুসঙ্গিক স্জাতব্য বিষয়

وَكَذَلِكَ — এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فَضْرَبْنَا عَلَىٰ إِذْنِهِمْ فِي الْكَهْفِ وَسِتِّينَ عَدَدًا দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كَذَلِكَ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِيَتَسَاءَلُوا বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয় ; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لام কে তফসীরবিদগণ لام عاقبت لام صيرورت নাম দিয়েছেন।—(আবু হাইয়ান, কুরতুবী)

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ — কাহিনীর শুরুতে সৎক্ষেপে বলা হয়েছিল যে,

গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আসহাবে কাহফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : رَبُّنَا أَعْلَمُ : অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্যে একজনকে পাঠানো হোক।

إِلَى الْمَدِينَةِ — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি

বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়ান তফসীর বাহরে-মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসূস'। বর্তমানে এর

নাম ‘তরসূস।’ কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল ‘আফসূস।’ অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ, তৎকালীন খ্রীষ্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসূস।

ثَوْرَتِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সায় সাথে এনেছিল। অতএব, বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।— (বাহরে-মুহীত)

أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا - অর্থাৎ, অর্থাৎ ‘অর্থাৎ’ শব্দের অর্থ পাক-স্বাচ্ছন্দ। ইবনে জোবায়রের তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্যে দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

بِرَجْمٍ وَرَجْمٍ - অর্থাৎ, ‘বিরজম’ শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

فَابْتِغُوا حَادًّا - আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্যে মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্যে তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয় — কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়।

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ - এ আয়াতে আসহাবে কাহফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

سَيِّئُونَ - অর্থাৎ, তারা বলবে, ‘তারা’ কারা— এ সম্পর্কে দু’রকম সম্ভাবনা আছে—(এক) এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।—(বাহর)

(দুই) سَيِّئُونَ বাক্যে নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল ‘মালকানিয়া’। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম

উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল ‘এয়াকবিয়্যা’। তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল ‘নাস্তরীয়া’। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।— (বাহরে-মুহীত)

وَأَتَيْنَاهُم - এখানে এ বিষয়টি প্রশিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে واو عاطفة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে— خَسَّةٌ سَادِسَةٌ كَلْبُهُمْ এবং ثَلَاثَةٌ رَّايَهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে واو عاطفة -এর سبعة -এর سبعة -এর واو عاطفة -এর سبعة -এর

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় واو عاطفة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে واو عاطفة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এজন্যেই এই-واو ثمان-কে-واو ثمان নাম দেয়া হত।— (মামহারী)

আসহাবে কাহফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়াজে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী ‘মুজামে আওসাত’ গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :

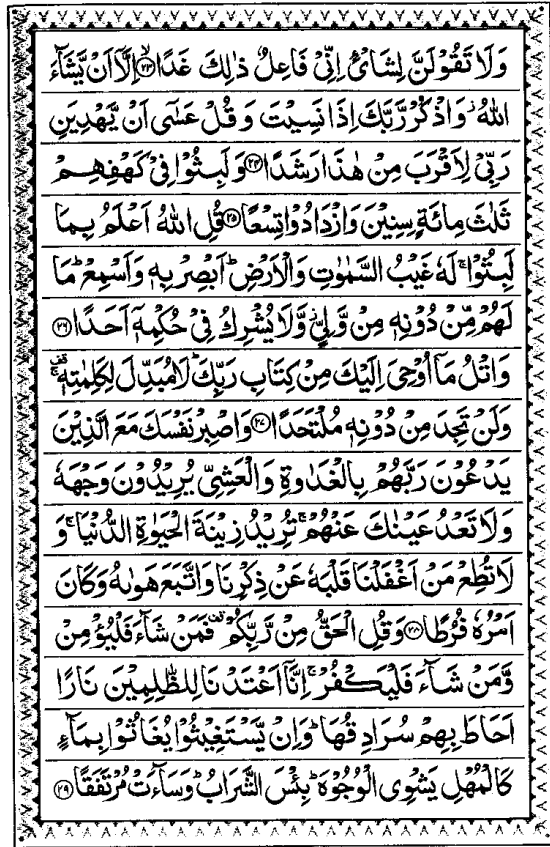
মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুনুস, যুনওয়াস, কায়ান্তারিতযুনুস।

فَلَا تُسَارِفِيهِمْ الْأَمْوَءَ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবী প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে



(২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামী কাল করব' (২৪) 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন : তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাণ্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেই তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন : 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুন।' আমি জালামদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেটনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পূজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ন করবে। কত নিকট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।

আসহাবে কাহফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ, এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী জ্ঞানার জন্যে খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও পয়গম্বরী-চরিত্রের পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চার আয়াতে আসহাবে কাহফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারও জ্ঞান নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার : যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্মরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতামতও বিভিন্মরূপ। অর্থাৎ, গুহায় নিদ্রাগ্রাণ থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضْرَبْنَا عَلَیْهِمْ إِذْ أَنْبَأَهُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ حَتَّىٰ ۝ বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জ্ঞান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিনশ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্যে ইনশাআল্লাহ বলা : 'লোবাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ক্রটির জন্যেও হুশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিজ্রপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জওয়াব নাখিল হল, তখন এর সাথে হেদায়েতের জন্যে এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ জ্ঞান গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়,

তবে যখনই সুরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের শীকারোক্তির জন্যে এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য— কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনা-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয়পক্ষের জন্যে শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় সুরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাসআলায় কোন কোন ফেকাহবিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাঙ্গের বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি। আবু হাইয়ান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদকারীদের কারণে পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার উক্তি হচ্ছে শুধু **اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে **اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ** বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশী। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিনশ'ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসাবে প্রতি একশ' বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ' সৌর-বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তবলীগের বিশেষ রীতি : **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ**—এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনে হিসন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের

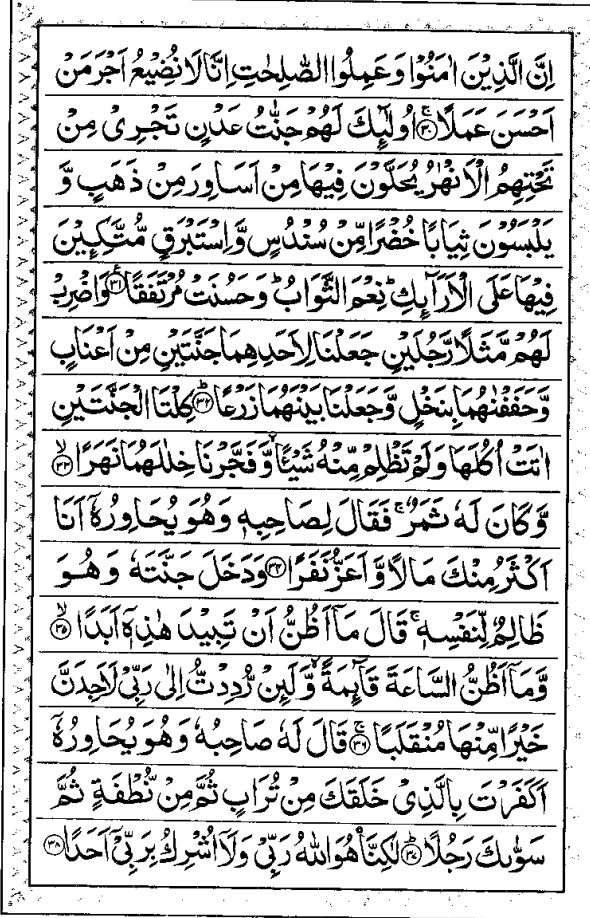
মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুইয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়—নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ** অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর এবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারা লাভ করবে।

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর সুরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্যে আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদেব প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।



(৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জ্ঞান। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (৩২) আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু' টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু' টিকে খজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু'—এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল : আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল : তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতীদের অলংকার : **يُحْمَلُونَ فِيهَا** এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্গের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্যে যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যেও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্যে স্বর্গের কোন অলংকার, এমনি স্বর্গের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে-কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, **شمر** শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল।

স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে **أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا** ও এ অর্থই বোঝায়।

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 إِنَّ تَرِينَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَوْ وُلِدَا ۗ فَعَلَىٰ سِرِّي أَن
 يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
 فَتُضَيِّعُ صَعِيدًا زَلَقًا ۗ وَيُصَيِّرْ مَا وَهِيَ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ
 لَهُ طَلِبًا ۗ وَأُحِيطْ بِشَمْرٍ ۗ فَاصْبِرْ يَقْرَبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا
 أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۗ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ رِجَةٌ يَنْصُرُونَهُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۗ هَذَا لِكَ الْوَلَايَةِ
 لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۗ وَاضْرِبْ لَهُم
 مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
 فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ
 الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۗ الْبَالُ وَ
 الْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۗ وَيَوْمَ نُسِطُ الْجِبَالِ وَ
 تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَسْرَتُهُمْ فَلَمْ يَخُذْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۗ

(৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্র দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তাল্লাশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগলঃ হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! (৪৩) আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহ্র। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। (৪৫) তাদের কাছে পার্শ্বব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে ন্যায় করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল-সবুজ ভূমি লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্শ্বব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সংকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ — শো' আবুল ইমানে হযরত আনাসের

রেওয়াজেতে ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে।) কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, খ্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَسْبَانَا হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস

এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোন অদৃশ্য বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কারভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, কোন অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকেও حَسْبَانَا শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ ۗ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ نَبَلْ زَعِمْتُمْ أَنَّنَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۗ وَوَضَعُ
 الْكُتُبَ فَتَرَىٰ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ
 يَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ نَبَلْنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْضَبْنَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَ
 لَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
 لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
 أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۗ وَهُمْ
 لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۗ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِينَ
 الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ
 زَعِمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
 مَوْبِقًا ۗ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ
 لَمْ يَجِدُوا عَمَّهَا مَصْرَفًا ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَارًا ۗ

(৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে : তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে : হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি— সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বজুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জ্বালমদের জন্যে খুবই নিকট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (৫২) যেদিন তিনি বলবেন : তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহ্বর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তকদ্রিয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ ۗ أَوَّلَ مَرَّةٍ

হবে : আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন : লোকসকল, তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ের, খালি গায়ে, পায়ের হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাঃ প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

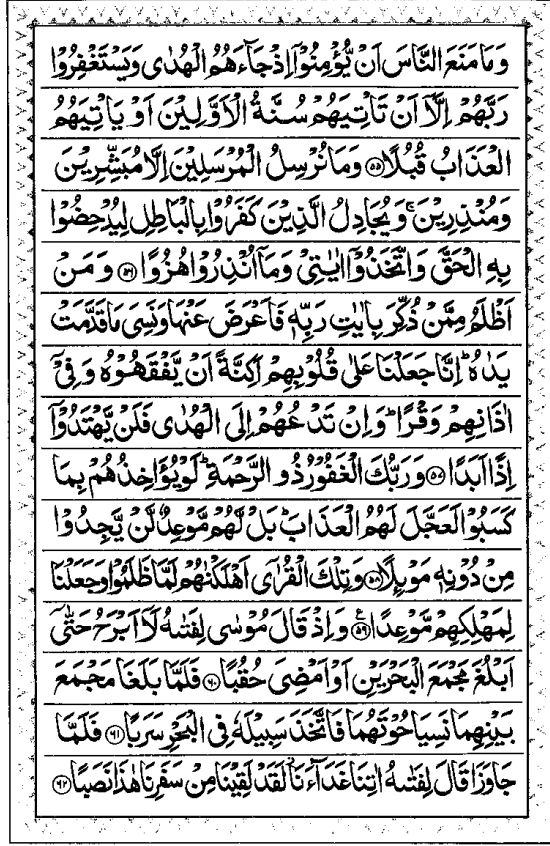
কুরতুবী বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়াজে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা, তারা কেয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।— (মাযহারী)

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ

উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নেয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে انا مالك আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্যে আগমন করবে। কোরবানীর জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে।

কোরআনে এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে اِنَّا يٰۤاَكُوْنُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়াজকে সাধারণতঃ রূপক অর্থে ধরা হয়।



(৫৫) হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আমাব সামনাসামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরাপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও যদ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জ্বালাম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সংপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সংপথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু, যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জ্বালাম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। (৬০) যখন মুসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেনঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেনঃ আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি : وَذُرِّيَّتَهُ এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে ذرية অর্থাৎ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমায়ে বাইনাস-সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর রাঃ রেওয়াজেতে উল্লেখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেনঃ তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না, যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা, বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেনঃ শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরাপেই প্রমাণিত আছে, ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ضَلَالًا সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে: রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেস করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবেঃ পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবেঃ আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবেঃ আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ্ বলবেনঃ সামনে লওহে-মাহফূয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবেঃ পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেনঃ নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয় রয়েছ। সে বলবেঃ পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরাপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক স্ভাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ এ ঘটনায় 'মুসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মুসা ইবনে ইমরান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

فتى এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করা না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فتى শব্দটিকে মুসা (আঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা (আঃ)-এর খাদেম।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নুন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আঃ)। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, সে মুসা (আঃ)-এর ভাগ্যে ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়াজে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নুন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।— (কুরতুবী)

جَمْعُ الْيَحْرُوزِ এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ বলেন : পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেনঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।— (কুরতুবী)

হযরত মুসা (আঃ) ও খিযিরের কাহিনী : সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াজেতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ একদিন হযরত মুসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা (আঃ)-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন : আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বন্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মুসা (আঃ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ, আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ বললেন : খলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বন্দার সাক্ষাত পাবেন। মুসা (আঃ) নির্দেশমত খলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নুনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং খলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জ্জযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। মুসা (আঃ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ডুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আঃ)

খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা' ইবনে নুনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ডুলে যাওয়ার ওয়র পেশ করে বলল : শয়তান আমাকে ডুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আঃ) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।)

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মুসা (আঃ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আঃ) বললেন : এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আঃ) বললেন : আমি মুসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন : বনী-ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন : হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছে থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না হে মুসা, আমাকে আল্লাহ তাআলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আঃ) বললেন : ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আঃ) স্থির থাকতে পারলেন না— বললেন : তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আঃ) ওয়র পেশ করে বললেন : আমি আমার ওয়াদার কথা ডুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুস্ত হবেন না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রথম আপত্তি ডুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিযির মুসা (আঃ)-কে বললেন : আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের মোকবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্য্যন্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে

দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আঃ) বললেন : আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহর কাজ করলেন ! খিযির বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওয়র-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আঃ) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন : **هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ** অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মুসা (আঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন : **ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِرْ عَلَيْهِ صَبْرًا** অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মুসা (আঃ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মুসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বর মুসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বন্দার কাছে মুসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আঃ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকলপের একটি নমুনা : **لَا أَمْرَ حَقِّيْ اَيْلَةَ حَيْمَةَ الْيَحْرِيِّنَ اَوْ اَمْضَى حَقِّيْ** এ বাক্যটি হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা' ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حَقِّيْ শব্দটি **حَقِيْبَةٌ** এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক ছকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক ছকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মুসা (আঃ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মুসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ

ও মুজোযা : **فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبَسُوا بِخُصْمَتِهِمَا فَاَتَتْهُمَا السَّيْبَةُ**

فِي الْيَوْمِ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে,

হযরত মুসা (আঃ) পয়গম্বরকূলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুওয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন গ্রন্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মুসা (আঃ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' মুসা (আঃ)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্যে এমন এক বন্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা (আঃ)-এর কাছে ছিল না। যদিও মুসা (আঃ)-এর জ্ঞান মর্তবীর দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্যে শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রশ্নবিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মুসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মুসা (আঃ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্ধেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্যে রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।—(কুরতুবী)

মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মুসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্যে। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হত না; কিন্তু মুসা (আঃ) আরও একটু কষ্ট করুক সম্ভবতঃ এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পথচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِينَا الْحُوتَ وَ
 مَا نُنسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَدْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
 الْبَعْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَمُوعُهُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا
 قَصَصًا ۖ فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
 وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَعْلَمُونَ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ آتَيْكَ عَلَىٰ
 أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا عَلِيمًا ۖ قَالَ إِنَّا لَنَسْتَطِيعُ
 مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ
 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
 لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
 قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَنَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا
 تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَمْرًا ۖ
 فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَتَسَدَّدْتُ
 نَفْسًا رَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ۖ

(৬৩) সে বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা সূর্য রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেন : আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন খরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বন্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাঁকে বললেন : আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে কিছুতেই ষেঁযধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ষেঁযধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মুসা বললেন : আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ষেঁযশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন : যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল : অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মুসা বললেন : আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ষেঁয ধরতে পারবেন না? (৭৩) মুসা বললেন : আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা বললেন : আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার **سَكْرًا** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্যে অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরী হয়ে যেত। বোখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন **وَإِنَّا لَنَسِينَا** ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন **وَأَنَّا لَنَسِينَا** শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুওয়তের প্রশ্ন : কোরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং **عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا** (আমার বন্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বোখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেকোনই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী। আল্লাহ্র ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহ্র ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, খিযির আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে :
وَمَا كُنَّا عَنْ أَمْرِهِ অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি; বরং আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আঃ) ও একজন নবী। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আঃ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহুর-মুহীত, আবু হাইয়ান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয় : অনেক মুর্থ, পথভ্রষ্ট, সুফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার

ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আঃ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তাঁর কোন শরীয়তের বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলা যায় না।

সাগরেদের পক্ষে উস্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য : **هَلْ أَتَعْبَكُ**

عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي وَمَا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا এখানে হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর

নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ওস্তাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।— (কুরতুবী, মাযহারী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েয নয় : **إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ**

بِهِ خُبْرًا হযরত খিযির (আঃ) মুসা (আঃ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জ্ঞান নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মুসা (আঃ) স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলেমের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আঃ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্যে কোন ওয়রও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আঃ)-এর জন্যে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।—(মাযহারী)

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মুসা (আঃ)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ওহী ও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণতঃ তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরীয়ত নায়িল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী-রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্যে সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ তাআলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আঃ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপারিখ আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্যে বৈধ করে দেয়া হয়, যার যিস্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতা বহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র।

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুওয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্যে যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্যে আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়— এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সুফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে—সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামাশুর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের রাঃ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন : কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খিযির (আঃ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যেও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, খিযির (আঃ) নবুওয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।—(মাযহারী)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝
 قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ سَيِّئِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبِي قَدْ بَلَغْتَ
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا تَيَآهَلَا أَهْلٌ فَرِيقًا سَطَعَتْ
 أَهْلُهَا فَأَيُّوَانٌ تُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا أُسْرِيًّا ۝
 يُدْنِقُ قَائِمًا وَقَالَ قَوْلُنَا لَعْنَتٌ عَلَيْهِمَا أَجْرًا ۝ قَالَ
 هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
 صَبْرًا ۝ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
 فَأَرَادَتْ أَنْ يُعَذِّبَهَا وَكَانَ وَرَاءُهَا كَلْبٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
 غَصْبًا ۝ وَآمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ يُخَبِّرُهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَادْنَا أَنْ يُبَيِّدَ لَهُمَا سُخْرًا حَرِيًّا وَرَبُّهُ
 أَقْرَبُ رَحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي
 الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
 رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْرِجَا كَتُمَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
 وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۝ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

(৭৫) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মুসা বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন : আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন : এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার—তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সংকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশত : ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্থপণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে বৈধধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (৮৩) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন : আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।

أَخْرَجَهَا لِلْعَرَبِ أَهْلًا ۝

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিযির (আঃ) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আঃ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি— মু'জ্জয়ার কারণে হোক কিংবা খিযির (আঃ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগতীর রেওয়াজেতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়াজেতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّىٰ إِذَا تَوَيَّأْنَا

আরবী ভাষায় غلام শব্দের অর্থ নাবালগ বালক। যে বালককে খিযির (আঃ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা زكية শব্দের অর্থ গোনাহ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালগদের আমলনামায় কোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَهْلٌ فَرِيقًا ۝

হযরত খিযির (আঃ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে সেটিকে এস্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়াজেতে 'আইকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ। — (মাযহারী)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরী করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরী।

মিসকীনের সংজ্ঞা : কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেসা পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাঙ্গী পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে। — (মাযহারী) فَأَرَادَتْ أَنْ يُعَذِّبَهَا وَكَانَ

وَرَاءُهَا كَلْبٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

বগতী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহর লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

وَأَتَى الْيَتِيمَ الْحَقَّ هযরত খিযির (আঃ) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অব্যাহতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সংকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আঃ) বলেন : আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সংকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِثَهُمْ فَأَرْسَلْنَا خُبْرًا بَصِيرًا وَكَرِهَ رَبُّنَا

এজন্যে আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ তাআলা এই সংকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ করবে।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনিযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

وَكَانَ حَسْبُكَ زَكِيًّا هযরত আবু দ্বারদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার।— (তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) বলেন : সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-ও এই রেওয়াজেটটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

(১) বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(২) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দুষ্টিস্তাগ্রস্ত হয়।

(৩) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তাআলাকে রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

(৪) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

(৫) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে; অথচ সংকাজে গাফেল হয়।

(৬) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিতানৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

(৭) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

পিতা-মাতার সংকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরও পায় : وَكَرِهَ رَبُّنَا এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মাধ্যমে এতীম বালকদের জন্যে রক্ষিত গুপ্তধনের হেফায়ত এজন্যে করানো হয়

যে, তাদের পিতা একজন সংকর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বন্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ তাআলা এক বন্দার সংকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফায়ত করেন।— (মাযহারী)

হযরত শিবলী (রহঃ) বলতেনঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্যে শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফেররা দাজ্জলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ, শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে বাগদাদের পতন।—(কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সংকর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ شِدَّةُ شِدَّةٍ এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবু হানীফার রাঃ মতে পঁচিশ বছর বয়সক্রম এবং কারও কারও মতে চল্লিশ বছর বয়সক্রম। কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে

حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُرْءَ أَشُدَّهُ وَكَرِهَ رَبُّنَا سِنَةً (মাযহারী)

হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে : হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে ; এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়াজে ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়াজে থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুস্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়াজে। তাতে বলা হয়েছে : যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো দাড়িওয়ালা জ্ঞানক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেবামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে। “আল্লাহর দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবার আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে বরং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাভর্ন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াল থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছেলে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবেলার জন্যে বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আঃ)।

ইবনে আবিদদুনিয়া ‘কিতাবুল-হাওয়াতিফে’ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে; সে বিরাট সওয়াব, মাগফেরাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই :

يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلظه المسائل ويا
من لا يبرم من الحاح الملحِين اذقني برد عفوك وحلاوة
مفرتك -

“হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না; হে ঐ সত্তা যাকে একই সময়ে করা লাখো-কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি, দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বার বার বললে বিরক্ত হন না; আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আশ্বাদন করাও এবং তোমার মাগফেরাতের স্বাদ দান কর।”

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

পঞ্চাশতের যারা হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে ওমর বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন

ارايتمكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى
ممن هو على ظهر الارض احد -

“তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ’ বছর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।”

হযরত ইবনে ওমর অতঃপর বলেন : এই রেওয়াজেত সম্পর্কে অনেকেই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ’ বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

কেউ কেউ খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্যে

অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে **لو كان موسى حيا لما** অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে **لو كان موسى حيا لما** জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ, আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আঃ)-এর জীবন ও নবুওয়ত সাধারণ পয়গম্বুদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন।

আবু হাইয়ান বাহুরে-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আঃ)-এর সাথে কয়েজন বুয়ুগের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, **والجمهور على انه مات**-অর্থাৎ, সাধারণ আলেমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।-(ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাহহারীতে কামী সানাউল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়্যদ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর কাশ্ফের মাধ্যমে যেকথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন : আমি নিজে কাশ্ফ জগতে হযরত খিযির (আঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : আমি ও ইলিয়াস (আঃ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্পয়োজন। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَيَسْأَلُونَكَ অর্থাৎ, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও সততা যাচাই করার জন্যে তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রুহ, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইন। তন্মধ্যে দু’টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল?—(বাহুরে মুহীত)



(৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৮৫) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৮৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছিলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন। আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৮৭) তিনি বললেন : যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৮৮) এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাছে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। (৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছিলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছিলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বোঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল হে যুলকারনাইন, ইয়াজ্জু ও মাজ্জু দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন : আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আশুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন : তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেন? যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্টি হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুল দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়াল) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল।

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি; বরং ইহুদীরা এ নাম বলেছিল। বোধহয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই :

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন—পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজ্জু-মাজ্জুের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ইহুদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তাঁর নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন্ দেশে কোন্ যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহুদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলাবাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্শ্ব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সমূল হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়াজে অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলাবাহুল্য, উপর্যুপরি পরিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে পুরাকাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়াজে এবং ইসরাঈলি কিসসা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সূধীবৃন্দের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়াজেই সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অস্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরিমিত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম

নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অভূত পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্যে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, সেগুলোর মর্যাদা কিসসা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়াজেত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান (রহঃ) ‘কাসাসুল-কোরআন’ গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চার জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু’জন ছিলেন মুমিন এবং দু’জন কাফের। মুমিন দু’জন হলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু’জন নমরূদ ও বখতে-নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খ্রীষ্টের প্রায় তিনশ’ বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, রুমী, ইত্যাদি উপাধিতেও সূরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, তিনি অগ্নিপূজারী মুশরেক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সংকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে-কাসীরের বক্তব্যে প্রথমতঃ জানা যায় যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি ঈসা (আঃ)-এর তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সম্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন।

দ্বিতীয়ঃ **وَإِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا** বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে-কাসীরের মতে তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়াজেতক্রমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন্ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলেকজান্দ্রির উক্তি-বিভিন্নরূপ।

ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী থেকে দু’হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আঃ)। ইবনে কাসীর ‘আলবেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্’ গ্রন্থে এ রেওয়াজেতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর জন্যে দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আযরকীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কোরবানী করেন।

আবু রায়হান আল-বেরুনী ‘কিতাবুল আসারিল বাকীয়া আনিল কুরুনিল খালীয়া’ গ্রন্থে বলেনঃ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবু বকর ইবনে সুমাই ইবনে ওমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুব্বা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তাঁর জন্যে গর্ববোধ করে বলেছেনঃ আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন।

আবু হাইয়ান বাহুরে-মুহীতে এ রেওয়াজেতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও ‘আল-বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্’ গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেনঃ এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা’ কূপের মোকদ্দমায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়াজেতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও বংশপরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর আমল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

فُلْ سَاءَ مَا كَرَّمُوا شَرِيحَةً এখানে প্রশ্নধানেযোগ্য বিষয় যে,

কোরআন পাক **ذَكَرَهُ** সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে **وَشَرِيحَةً** এ দু’টি শব্দ কেন ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু’টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আরবী অভিধানে **سَبَب** শব্দের অর্থ

এমন বস্তু যদ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।— (বাহুরে-মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যে একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ** বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্যে সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন।

فَأَتَيْنَاهُ سَبَبًا অর্থাৎ, সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি

তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

حَتَّىٰ رَأَىٰ لَبَكَةً مَّعْرُوبَ الشَّمْسِ অর্থাৎ, তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা

পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

قِي عَيْنٍ حَيْثُ - قِي عَيْنٍ حَيْثُ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা, এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার পশ্চিমদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا অর্থাৎ, ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তাআলার যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ, প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সক্ষম কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন : আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সৎপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

فَلَمَّا يَدْعُونَ الْقَرْيَةَ এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ তাআলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়াজেতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে নবুওয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, হযরত মুসা (আঃ)-এর জননী জন্নে কোরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা

হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন : এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুওয়তের ওহী ব্যতীত দেয়া যায় না—কাশফ, এলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিস্তৃত নয়।

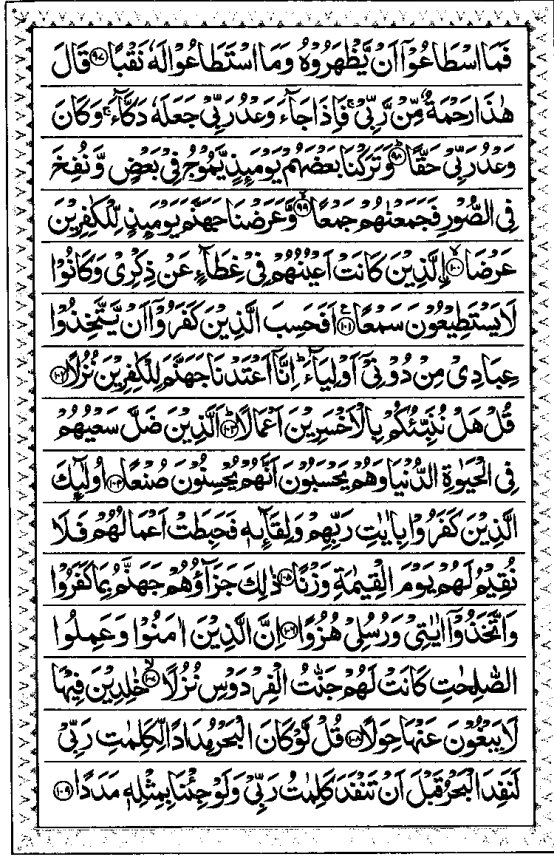
যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।— (বাহরে-মুহীত)

শব্দার্থ : بَيْنَ السَّدَيْنِ যে বস্তু কোন কিছুর জন্যে বাধা হয়ে যায়, তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَيْنِ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

শব্দটি زُرِّ الْعَيْدِ - زُرِّ শব্দটি এরব্রা এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্যে নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الصَّوْنِ দুই পাহাড়ের বিপরীত মুখী দুই দিক :

وَقَطْرًا অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারণ কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।—(কুরতুবী)



(৯৭) অতঃপর ইয়াজ্জুজ ও মাজ্জুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন : এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। (৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিক্ষায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার সুরাণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। (১০২) কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্শ্ববর্তীভাবে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম - এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রোপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (১০৯) বলুন : আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ, যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত : ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়াজেতে ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ ও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উস্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধ ও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতেও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে : وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ

هُمُ الْبَاقِيُونَ অর্থাৎ, নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াজ্জুজের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে-সামআন (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন ভোর বেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণতঃ সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেৎনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণতঃ জান্নাত ও দোযখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম,) যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ, অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরয় করলাম : আপনি দাজ্জালের

আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেৎনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুরবৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফেৎনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেৎনা অধিক ভয়েরযোগ্য। (অর্থাৎ, দাজ্জালের ফেৎনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মোকাবেলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে,) সে যুবক, ঘন কঁোকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুতনা। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারার 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাজ্জালের সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেয়া উচিত। (এতে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহ্র বান্দারা, তোমরা তার মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরম্ভ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াস্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্ , সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন : সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কঁুজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থ কড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনূর্বর ভূমিকে সম্প্রদায় করে বলবে : তোমরা গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরাদে তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিন্তে চলে

আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তাআলাই হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবলুদে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করবেন : আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান।

(সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইয়াজ্জ-মাজ্জের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্ত্রসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাদি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজ্জ-মাজ্জের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন : তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদসীর্ণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহ্বারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রের দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে

এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শুভখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ তাআলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাকের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে-ইয়াযীদের রেওয়াজেতে ইয়াজ্জ-মাজ্জের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে : তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজ্জ-মাজ্জ বায়তুল-মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাঙ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়াজেতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাঙ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনীর পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনীর নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন : আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাঙ্জাল, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাঙ্জাল বলবে : লোক সকল। যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে : না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাঙ্জালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাঙ্জাল। দাঙ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু সমর্থ হবে না। - (মুসলিম)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন : আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরয় করবেন, হে পরওয়ারদেগার, তারা কারা? আল্লাহ তাআলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজ্জ-মাজ্জের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজ্জ-মাজ্জের লোক, আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। - (রুহুল-মা'আনী)

ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ” গ্রন্থে এসব রেওয়াজেতে উল্লেখ করে বলেন : এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হবে।

মুসনাদ আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ঈসা (আঃ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়াজেতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। “ফতহুল বারী” গ্রন্থে হাফেজ ইবনে-হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছরে মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না। - (মুসলিম ও আহমদ)

বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ্ব ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। - (মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাত এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

“আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।” আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তজনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান।

হযরত যয়নব (রাঃ) বলেন : একথা শুনে আরয় করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে সংকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অন্যারের আধিক্য হয়। - (আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ) ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। - (ইবনে কাসীর, আবু হাইয়ান)

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল খুঁড়বে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজ্জ-মাজ্জকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তাআলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা যেহনত শেষে বলবে : আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ” গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নয়; বরং কা’ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। - (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাফেজ ইবনে-হাজার “ফতহুল বারী” গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাতে দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন : তাঁরা সবাই হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ্ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে-আরাবীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু’জ্জিয়া রয়েছে। (এক) আল্লাহ্ তাআলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিব্বিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। (দুই) আল্লাহ্ তাআলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-মুনাব্বেরের রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যত্নপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। (তিন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে ‘ইনশাল্লাহ্’ বলার কথা জাগ্রত হলে না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করবে। - (আসারাতুস-সায়্যা, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে কেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশাল্লাহ্ কলেমা

বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল : উল্লেখিত হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে :

(১) ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াকেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলাবাহুল্য যে, ইয়াকেসের বংশধর নূহ (আঃ)-এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, যালেম। মোগল, তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

(২) ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দেশের ব্যবধান। - (২নং হাদীস)

(৩) ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন। - (১নং হাদীস)

(৪) ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। - (কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাশাস্তি ও লুটতরাজের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহ্র রসুল হযরত ঈসা (আঃ) ও আল্লাহ্র আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেল্লা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। - (১নং হাদীস)

(৫) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পক্ষপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে। - (১নং হাদীস)

(৬) অতঃপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সামান্য করা হবে। - (১নং হাদীস)

(৭) এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদগীরণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কেউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ

করবে।— (৩ নং হাদীস)

(৮) শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্জ ও ওমরার অব্যাহত থাকবে। (৪নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)—এর ওফাত হবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ, তিনি হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজাজ সফর করার সময় ওফাত পাবেন।— (মুসলিম)

(৯) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বোঝাচ্ছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। **والله اعلم**

(১০) হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন।— (৩নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহদী (আঃ)—এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরখঞ্জী “আসারাতুসসায়াহ্” গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন : দাঙ্জালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈসা (আঃ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : হযরত মাহদী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)—এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকত ও গুণ্ডধন উদগীরণ করে দেবে। কেউ ফকীর-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আঃ)—এর শেষ আমলে দাঙ্জাল এসে মক্কা, মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেৎনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফেৎনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফেৎনা। দাঙ্জালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মত। এখানে প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা, শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাঙ্জাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিব্যাত্মির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিব্যাত্ম পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ' ষাট দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। মোটকথা, দাঙ্জালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাঙ্জালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফেৎনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজও বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)—এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষভাগে এবং ঈসা (আঃ)—এর আমলের শুরুভাগে দাঙ্জাল ও ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের দু'টি ফেৎনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় এবং সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আঃ)—এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিন্দু এবং বিষাক্ত জীব-জন্তুও একে অপরকে কষ্ট দেবে না।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত অবস্থিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসঙ্গেও বিরোধী পক্ষের আবেল-তাবেল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলোচনা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুন্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন : বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্যে অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ) কুরতুবীর সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফেৎনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফেৎনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফেৎনাকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের আবির্ভাব বলেননি, যা কেয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)—এর অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীর রুহুল-মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন : এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেৎনা ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের ফেৎনার সমতুল্য।— (১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ

বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজ্জ-মাজ্জ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফেৎনা ইয়াজ্জ-মাজ্জের ফেৎনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজ্জ-মাজ্জ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজ্ঞিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাঞ্জাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজ্জ-মাজ্জের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্য সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথমদিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌঁছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে খরদাযবাহ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁর মুখপাত্র সালামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে — (ইবনে খলদুনের ‘মুকাদ্দামা’ ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও “আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবন্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন : যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতা-পাতা বিহীন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। — (তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শুজ্জয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) “আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আঃ)” গ্রন্থে ইয়াজ্জ-মাজ্জ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়াজেতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন : দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে এক নয়— বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়ান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শ’ মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট ‘ফগফুর’। এর

নির্মাণের তারিখ আদম (আঃ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শ’ ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা “আনকুদাহ্” এবং তুর্কীরা “বুরকুরকা” বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ামী (রহঃ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইয়াজ্জ-মাজ্জের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজ্জ-মাজ্জের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জমেনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট কাশ্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌঁছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান — (তফসীরে জওয়াহেরুল-কোরআন, তানতাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী ‘মুজামুল বুলদানে’, ইন্দরীসী ‘জুগরাফিয়া’য় এবং বুস্তানী দায়েরাতুল মাআরিফে’ এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়ী নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন :

এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছে। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ীর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন : গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে। — (দায়েরাতুল-মা’আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্তা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়— দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবতঃ দরবন্দ নাম দ্বারা প্রতারণিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। (এক) দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দে প্রাচীর এবং (দুই) আরও উচ্চ কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর : উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাম্বীরী (রহঃ) “আকীদাতুল ইসলাম” গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীরসমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উথিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাজ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরের রুহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াম ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাঙ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ ও দাঙ্জাল হত্যার পরে। দাঙ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে— একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়— যদি যেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্বপ্নে পরিণতকারী

সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত দাঙ্জালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত ওস্তাদ আল্লামা কাম্বীরী (রহঃ)—এর সূচিষ্ঠিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অনুেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কেয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়।

যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে— এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআন পাকের আয়াত—
وَأَنبَاءَ وَعَدَّتِي جَمَلًا
وَأَنبَاءَ অর্থাৎ, যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ, ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ্ তাআলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এ আয়াতে **وَعَدَّتِي** (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ কেয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষা এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ্ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কেয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সেমতে সব তফসীরবিদই **وَعَدَّتِي** এর অর্থ উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহরে—মুহীতে বলা হয়েছে :

**والوعد يحتمل ان يراد به يوم القيامة وان يراد به وقت خروج
 ياجوج وماجوج**

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফেৎনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেৎনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফেৎনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেৎনা এমন অকৃত্রিম হত্যাকণ্ড, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ-মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেৎনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশী।

তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমতঃ এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে معلুল দ্বিতীয়তঃ এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ যেদিন ‘ইনশাল্লাহ্’ বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কেয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোটকথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কেয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কেয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না; তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কেয়ামত পর্যন্ত কায়ম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। واللّه اعلم بحقیقة الحال

بعضهم - بعضهم এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে— বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

فَصَحَّحَهُمُ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِمْ

তফসীর বাহরে-মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, فَيَجِدُ بِهِمْ نَعْمًا وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ الْاِتِّخَاذِ উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে; তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মুর্খতা।

عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বর গণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওয়ায়ের ও ঈসা (আঃ)। কিছুসংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওয়ায়ের (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে الَّذِينَ كَفَرُوا বলে কাফেরদের

এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে “আমার বান্দা” অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং الَّذِينَ كَفَرُوا এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ “আমার বান্দা” অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আশুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাহরে-মুহীতে প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

أُولَئِكَ এটি وَلِي এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে

অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সং মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু’টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে লোক দেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারেজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু’তায়েলা, রাওয়াকফেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী এবং কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

তাই কুরতুবী, আবু হাইয়ান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্ কেয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যতঃ তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা’দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا تُؤْتِيهِمُ اللَّهُمَّتُمْ الْفَيْمَةَ وَرَأَى

অর্থাৎ, তাদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা, কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়াজে মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহ্র কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর :

فَلَا تُؤْتِيهِمُ اللَّهُمَّتُمْ الْفَيْمَةَ وَرَأَى

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের